Aslaf Academy

লেকচার ১৭ : প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল – জামি।

লেকচার ১৭ : প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

প্রথম হিজরিতে নবীজি (সঃ) -

নবীজি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে কুবায় অবস্থান করছিলেন, সে সময় তার নির্দেশে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামি সন ও তারিখের সূচনা করেন এবং 'মুহাররম'-কে হিজরি সনের প্রথম মাস নির্ধারণ করা হয়। তখন থেকেই এই সন গণনার শুভ সূচনা।[1]

প্রথম হিজরিতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী মুহাজির সম্প্রদায় এবং মদিনায় বসবাসরত আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এক বিরল উপমা স্থাপন করেন। মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্বের এই বিরল বন্ধনটি পৃথিবীর অন্যান্য বন্ধনের ইতিহাসের মতো একটি প্রথা ও দফাসর্বস্ব কোনো কীর্তি ছিলো না; এটি ছিলো আনসারদের সম্পদ ও সম্পর্কে মুহাজিরদের উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির মতো একটি অভাবিত ভ্রাতৃত্ব-চুক্তি। প্রথা, বংশগত গৌরব, অন্যায় ও অনুচিত দাবির অযৌক্তিতার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর রাসূল (সঃ) শুধুমাত্র ইসলামকে অগ্রগণ্য রাখার দাবিকে প্রধান করে সকল মুসলিমদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক চুক্তি সম্পাদন করেন।

পারস্পরিক বৈপ্লবিক চুক্তি ও জাহেলি জীবনের অবসান -

এ চুক্তি লিখিত হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে। এবং তাঁদের অনুসারী সকল মুসলিমদের জন্য। এ চুক্তির দফাগুলো ছিল এমন—

[1] সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ:৫৮

১. 'মুহাজির-আনসার' এই জনগোষ্ঠী সকল মানুষ থেকে ভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ।

২. মুহাজিরগণ নিজেদের পূর্ব নিয়মানুযায়ী নিজেদের মধ্যে দিয়ত (হত্যার বিনিময়) দিবে এবং মুমিনদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে বন্দিদের মুক্তিপণ প্রদান করবে। আনসারদের সকল গোত্র নিজেদের পূর্বের অবস্থা অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে দিয়ত প্রদান করবে এবং তাঁদের সকলে ঈমানদারদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় আপন বন্দিদের জন্য মুক্তিপণ প্রদান করবে।

৩. ঈমানদাররা কোনো সহায়-সম্পদহীনকে (এতিম) মুক্তিপণ ও দিয়ত প্রদানের ব্যাপারে উত্তম পন্থা ও সম্মানের সাথে দান করবে।

৪. সকল মুমিন ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, যারা তাঁদের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও গণ্ডগোলের পথ বেছে নেবে।

৫. মুমিনরা কাফেরদের বিরুদ্ধাচরণ করবে; যদিও তাদের মধ্যে কেউ আপন পুত্রও হয়।

৬. কোনো কাফেরের বদলে কোনো মুমিন কোন মুমিনকে হত্যা করবে না।

৭. কোনো মুমিন কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফেরকে সাহায্য করবেন না।

৮. আল্লাহর জিম্মা (অঙ্গীকার) একই হবে। একজন সাধারণ মানুষের প্রদানকৃত জিম্মা সকল মুসলমানের জন্য সমানভাবে পালনযোগ্য হবে।

৯. যে সকল ইহুদি মুসলিমদের অনুগামী হবে, তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে এবং তারা অন্য মুসলিমদের মতো হয়ে যাবে। তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা যাবে না; কিংবা তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্যও করা যাবে না।

১০. মুসলিমদের সম্পাদিত সন্ধি হবে একই। কোনো মুসলিম কোনো মুসলিমকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো সন্ধি করবে না; বরং সকলে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই তা করবে।

১১. মুসলিমরা ওই রক্তপাতের ব্যাপারে সমান অধিকার রক্ষা করবে, যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হবে।

১২. মুসলিমরা কোনো মুশরিককে আশ্রয় দিবে না, তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করবে না, আর কোনো মুমিনের হেফাজতের ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবে না।

১৩. যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হত্যা করবে এবং তা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তার নিকট থেকে হত্যার বদলা গ্রহণ করা হবে।

১৪. যে সকল মুমিন এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে বিরুদ্ধচারী মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৫. কোনো মুমিনের জন্য এটা সঙ্গত হবে না যে, যারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে (বেদাতি), তাদের কার্যকলাপে সাহায্য করা অথবা তাদের আশ্রয় দেওয়া, কিংবা যে তাদের সাহায্য করে, তাকে আশ্রয় দেয়া। যে এরূপ করবে, কেয়ামতের দিন সে অভিশাপ এবং গজবে নিপতিত হবে এবং তার ফরজ ও নফল কোনো ইবাদতই কবুল হবে না।

১৬. তোমাদের মধ্যে যখনই কোনো মতভেদ পরিলক্ষিত হবে, তখনই তা আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিয়মানুযায়ী ফয়সালা করবে।[2]

তাছাড়া মদিনার ইহুদিদের সাথে সম্পাদন করেন পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম আধুনিক ও অভিনব সম্প্রীতি-চুক্তি, যা ছিলো একটি রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোকে সুসংহত ও দৃঢ় করার লক্ষ্যে নজিরবিহীন একটি উদ্যোগ। ৪৭টি ধারায় বিন্যস্ত মদিনা সনদ নামে বিখ্যাত এই চুক্তি পৃথিবীর আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ সংবিধান বলে বিবেচিত। এছাড়াও মক্কার কাফেরদের হুমকি এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মদিনার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যখন ঘোলাটে হতে শুরু করে, তখন আত্মরক্ষার উপায় ও অংশ হিসেবে মুসলিমদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এ হিজরিতেই জিহাদের নির্দেশ করা হয়—পরবর্তীতে নানা পরিপ্রেক্ষিতে ও অবস্থা বিবেচনায় যে নির্দেশনার আরও উপযোগিতা ও বিস্তৃতি ঘটে। জিহাদের নির্দেশ মোতাবেক এ হিজরিতে দুইটি সারিয়া প্রেরণ করা হয়—একটি হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে, অন্যটি হযরত উবাইদা ইবনুল হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে।

প্রথম সারিয়াহ –

[2] হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৭৮-১৮০

হিজরতের ৭ মাস পর পবিত্র রমজান মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ৩০ জন মুহাজিরের আমির বানিয়ে সাদা পতাকা হাতে কুরাইশদের একটি কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা যখন সমুদ্রের তীরে পরস্পর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন, তখন মাজদি ইবনে ওমর জুহানি মধ্যস্থতা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। [3]

দ্বিতীয় সারিয়া -

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১ম হিজরির শাওয়াল মাসে হযরত উবায়দা ইবনুল হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ৬০ জন লোকের আমির নিযুক্ত করে বাতনে-রাগেব অভিমুখে আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেই হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর কাফেরদের উপর এটাই ছিলো ইসলামের পক্ষ থেকে ছোঁড়া প্রথম তীর।[4]

দ্বিতীয় হিজরিতে নবিজি (সঃ) -

এ বছর ইসলামের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। নবীজির আকাঙ্ক্ষায় বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর কাবা শরিফকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।[5]

---

[3] সহিহ বুখারি খণ্ড ২ [হিন্দুস্তানি নুসখা] / হাযাল হাবিবু মুহাম্মাদ সা. পৃ: ১৮৬-১৮৭

[4] হাযাল হাবিবু মুহাম্মাদ সা. পৃ: ১৮৭-১৮৮

[5] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ:২০৮

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বাধীন সারিয়া ইসলামের পক্ষে সর্বপ্রথম গনিমতের অধিকারী হয়। এ বছর বদরের যুদ্ধ হয়। [6]

বদরের যুদ্ধ –

কুরাইশদের একটি ব্যবসায়িক কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্যই নবীজি বের হয়েছিলেন। কিন্তু কাফেলা প্রধান আবু সুফিয়ান মুসলামানদের আগমন টের পেয়ে যায়। এবং মক্কায় সাহায্যের আবেদন পাঠিয়ে পথ পরিবর্তন করে ফেলে। মক্কার কুরাইশরা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ে। এদিকে নবীজির ইচ্ছা ছিল কেবলই কাফেলাকে রুখে দেয়া। জিহাদের উদ্দেশ্যে তিনি বের হননি বলেই গবেষকদের অভিমত। মক্কার কাফেরদের যুদ্ধের জন্য ধেয়ে আসার খবর শুনে তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলেন। মুহাজির এবং আনসারদের ঐক্যমত্য সিদ্ধান্তে বদর প্রান্তরে কাফেরদের মুখোমুখি হয় মুসলিম বাহিনী। এ যুদ্ধে কাফেররা ছিল ১০০০ এরও বেশি। মুসলিমরা ছিলেন কেবল ৩১৩/৩১৪ জন। তাছাড়া কাফেররা অস্ত্র ও বাহনে পরিপূর্ণ ছিল। এবং তাদের পুরো বাহিনীই ছিল রণসাজে সজ্জিত। বিপরীতে মুসলিমরা ছিলেন একেবারেই সম্বলহীন। ৭০ টি উট, ২-৩ টি ঘোড়া আর গুটিকয়েক তলোয়ার ছাড়া তাদের কিছুই ছিল না। ছিল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও অসীম সাহস। আল্লাহ তাআলা বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছিলেন নবীজিকে। ফলে আসমানী সাহায্যে মুসলমানরাই পরাক্রমশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। কাফেরদের বড় বড় নেতাদের মৃত্যুর মাধ্যমে এবং এ বিজয়ের সূচনা ধরেই পরবর্তীতে ইসলামের গতিশীল অগ্রযাত্রা সহজ হয়েছিল। বদর থেকে ফেরার পথে দুই ঈদ, যাকাত-সদকা, কোরবানি ওয়াজিব হয়েছিল। এবং ষড়যন্ত্রের কারণে ইহুদি গোত্র বনু কাইনুকা'কে মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।[7]

---

[6] বিস্তারিত– আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ২০৯-২১১

[7] বিস্তারিত— আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ:২১১-২২৭/ হাযাল হাবিবু মুহাম্মাদ সা. পৃ: ২১০-২৪১

শিক্ষণীয় বিষয় -

এখানে একটি আপত্তি বা সংশয়ের জবাব।

বদরের যুদ্ধ আক্রণনাত্মক ছিল নাকি রক্ষনাত্মক এটা নিয়ে প্রাচ্যবাদের একটা ধোঁয়াশা আছে। ইসলামী স্কলারদের অনেকে এতে বিব্রত হয়ে দুই দিকের মতই দিয়েছেন। যারা বলেছেন আক্রণনাত্মক ছিল, তাদের দলিল হলো, নবিজি কুরাইশী বণিক কাফেলাকে দমন করতে বের হলেও পরবর্তীতে কুরাইশ বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য বদরের প্রান্তরে গিয়েছেন। সে হিসেবে এটা আক্রণনাত্মক জিহাদই ছিল।

কেউ বলেছেন রক্ষনাত্মক ছিল। তাদের দলিল হলো, নবিজি কুরাইশী বণিক কাফেলাকে দমন করতে বের হয়েছিলেন, যুদ্ধের জন্য নয়। পরবর্তীতে কেবল কাফের বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে জিহাদ করেছিলেন। সুতরাং এই হিসেবে এটা রক্ষনাত্মক জিহাদ ছিল।

বুদ্ধিমান গবেষকরা এখানে সমন্বয় করেছেন। তারা বলেন, বদরের জিহাদ একইসাথে আক্রমণাত্মক আবার রক্ষণাত্মকও। সুতরাং, প্রাচ্যবাদ যে ধোঁয়াশা তৈরি করতে চায়, তা অমূলক। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফীক দান করুন আমিন।